সেপ্টেম্বর ২, ২০২২

মাহবুবুর রহমান

আমি মাহবুবুর রহমান, লোকে আমাকে ম্যাশ নামে চেনে। এক অর্থে বলতে পারেন, আমার দুটো নাম। আমার দুটো জন্মদিনও। জন্মেছি ১৪ এপ্রিল ১৯৮১, কিন্তু সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট দেবার সময় স্কুল থেকে লেখা হলো ১২ জুলাই ১৯৮১। সেই ভুল রয়ে গেল সনদে। জন্মেছি সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জের এক প্রত্যন্ত, এলাকায়। হাওর-বাওড়-নদী ঘেরা এলাকা, নৌকাই একমাত্র পরিবহন। গ্রামের নাম ভাটিপাড়া। ১৯৭৬ সাল থেকে বাবা ছিলেন ওখানকার পুবালী ব্যাংকের ম্যানেজার, মধ্যবিত্ত পরিবার আমাদের। আমি যখন জন্মেছি, তখন স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স প্রায় দশ বছর, যুদ্ধপরবর্তী ভঙ্গুর দেশ। মা ফ্যামিলি প্ল্যানিং ভিজিটর হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চেষ্টা করছিলেন, ফলে কিছু পারিবারিক সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। মা সময়ের চেয়ে এবং সেই এলাকার চেয়ে আধুনিক ছিলেন, তাঁকে তাঁর বাবা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বাঁধা দেন, তবু মা পড়ালেখা চালিয়ে গেছিলেন। লোকে আমার বাবাকে বিদ্রুপ করে বলতো—বৌয়ের রোজগার খাও, নিজে রোজগার করতে পারো না? ইত্যাদি। কিন্তু বাবা ওসবে ভ্রুক্ষেপ করেননি, মা যখন ট্রেনিং-এ, বাবা আমাদের চমৎকার দেখভাল করেছেন- ইতিহাস আর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা পাঁচ ভাইবোন, এক বোন, চার ভাই। আমি তৃতীয়। বোন মমতাজ সুলতানা সবার বড়, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা। বড় ভাই এন.আর.বি. ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এখন ব্যাংকিং ছেড়ে পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। আমার পিঠাপিঠি ছোট ভাই এস.আই.বি.এল. ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ওর বৌ ডাক্তার। আর সবচেয়ে ছোট ভাই সস্ত্রীক পর্তুগালে থাকে, ব্যবসা করে। পড়ালেখায় সবাই চৌকস, আমি ছিলাম সবচেয়ে দুর্বল। যেহেতু বাবা-মা দুজনই কাজ করতেন, আমরা ভাইবোনরা খাবার পরিবেশন, ধোয়াধুয়ি ইত্যাদি নানান গার্হস্থ্য কাজ করতাম। সবাই মিলে একসংগে খেতে বসতাম। সেই আনন্দ-কোলাহল ভোলা যায় না।

বাংলাদেশে থাকাকালীন একপর্যায়ে লক্ষ্য করলাম, আমি মুক্তচিন্তক কিন্তু লোকে আমাকে নাস্তিক ভাবছে। আমাকে পরিবারে-সমাজে অনেকেই সহ্য করছে না। আমার মুক্তচিন্তক, নাস্তিক বন্ধুরা ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে, খুন হচ্ছে। মানুষ মানুষকে মানবিক সম্মান দিচ্ছিল না, সমাজে সমতা নেই, পয়সা থাকাটাই সব। ভয় ঢুকে গেল মনে। এমনিতে আমার খুব আত্মবিশ্বাস ছিল, ব্যবসা করছিলাম, ব্যাংকে কাজ করছিলাম, যায় যায় দিন পত্রিকায় কাজ করছিলাম, প্রথম আলো পত্রিকার সিলেট বন্ধুসভার প্রেসিডেন্ট ছিলাম। নানান জেলায় স্কুলে স্কুলে বইপড়া, মাদকাসক্তি, খেলাধুলা করা ইত্যাদি নিয়ে মানুষকে সজাগ-সচেতন করতাম। নরউইচে এখন বাংলাদেশী কমিউনিটির ভেতর যেমন করি, তেমন।

২৬ ডিসেম্বর ২০১১, বক্সিং ডেতে আমি লন্ডনে আসি। এর আগ পর্যন্ত আমি মূলত বাংলাদেশেই ছিলাম। বারকিং-এ একটা ভাড়া বাড়িতে উঠি। রাতে সেখানে মাতলামি শুরু হয়। পরদিন আমি চলে যাই ভাইয়ের কাছে কেন্টে, তারপর সোজা বার্মিংহ্যামে। পরের ছয় মাস সেখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করি। হোম অফিস আমার কলেজ বন্ধ করে দেয়। লুটনে চলে যাই। সেখানেই আমার দেখা হয় কার্লিন বেলসির সঙ্গে, নরউইচের মেয়ে। জুন ২০১২ তে আমি নরউইচে চলে আসি। সমুদ্রের পাড়ে যাই, লোস্টফট যাই, অপূর্ব সব প্রাকৃতিক দৃশ্য, কিছু অত্যন্ত কোমল-মুক্তমনা মানুষ আমাকে গ্রহণ করেন। দুএকটি বর্ণবাদী ঘটনারও সম্মুখীন হই। তিন-চার সপ্তাহের ভেতর কার্লিন জানায় সে গর্ভবতী। পরপর আমাদের তিন কন্যার জন্ম হয়। এঞ্জেল ৯, আভা ৮ আর অঞ্জলি ৬।

আমার দাদা তাইমুস আলি, জন্মেছেন ৩ জুন ১৯১২, মৃত্যু ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭, বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মিতে নায়েক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৪২-এ যোগ দিয়ে চার বছর ইতালি-ফ্রান্স-আফ্রিকাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করেন, বার্মা মেডেল পান। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ১৯৬৩ তে ভাউচার ভিসায় তিনি বৃটেনের বার্মিংহ্যামে এসে কাজ শুরু করেন, ১৯৭০এ ফিরে যান বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) । ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে তাঁর পাসপোর্টটি চুরি হয়ে যায়, তিনি আর বৃটেনে ফিরতে পারেননি।

নরউইচে প্রথম চাকরি করি রিসাইক্লিং-এ, এরপর বার্নার্ড ম্যাথিউজে, তারপর প্রিন্টিং-এ। বাংলাদেশে ব্রোকার হাউজ চালানোর অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগে। ২০১৪তে নরউইচে আমার ব্যবসা শুরু করি। ২০১৮সালে সব কিছু ভেঙে পড়ে, আমাদের ডিভোর্স হয়, কোর্ট আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বাড়ি-সংসার-সন্তানদের দেখার অধিকার সব একসঙ্গে হারাই, ইমিগ্রেশনেও ঝামেলা হয়। পরমবন্ধু অ্যানেলি ক্লার্কের মাধ্যমে আমি ন্যাশনাল সেন্টার ফর রাইটিং-এর সঙ্গে পরিচিত হই।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো একক ঐতিহ্যকে ধারণ করি না। আমি যেমন সিলেটের, তেমন ঢাকার, তেমন নরউইচের। আমার কন্যারা বাংলা ঘুমপাড়ানি গান শুনে ঘুমাতো। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের জীবনে একবারই দেখা হয়েছিল। তাদের মাতৃভাষার ওপর তো আমার হাত নেই, ধর্মও আমি চাপিয়ে দিতে চাই না। নরউইচে থাকাকালীন আমি দেখলাম, এখানকার বাঙালিরা বড় পরিসরে উপস্থাপিত হন না। ড্রাগন হলে ক্রিসের সঙ্গে আলাপ হলো, বেঙ্গলি স্টোরিজ এবং স্টোরিজ ফ্রম দ্য কোয়ার্টার প্রজেক্টে জড়িয়ে পড়লাম। প্রথমদিকে এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে আমার তেমন ওঠাবসা ছিল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমার জীবনদর্শনকে ওঁরা কিভাবে নেবেন, আমি তথাকথিত ধার্মিক নই, আমি পাবে-ক্লাবে যাই, পশ্চিমা উৎসবে শরীক হই। হয়তো ওঁরা ভাববেন ওঁদের সন্তানদের ওপর আমি বাজে প্রভাব ফেলব। রোক্সহামে আমি ডেলিভারি দিতে যেতাম, সেখানে ড. ময়েনের সঙ্গে আলাপ হয়, তাঁর মাধ্যমে আরো কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই, ক্রিকেট খেলি, সম্পর্ক তৈরি হয়। লন্ডন আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা কোর্স, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফি কোর্সটা আর এই প্রজেক্টগুলোর কারণে সমাজের জন্য কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেল।

আমার ছোট্ট মেয়েরা এখনো এই প্রজেক্টগুলোকে বুঝতে অক্ষম, তবু আমি ওদের নিয়ে আসি। জীবন কী করে যাপিত হয়, গল্প তৈরি হয়, স্মৃতি তৈরি হয় তা হয়তো আগামীতে বুঝবে। এখন ওরা প্রজেক্টের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে শুধু গানটা কান পেতে শোনে। কুড়ি বছর পরে যদি এসবের কোনো চিহ্ন তারা নিজের ভেতর দেখতে পায়, তবেই বুঝব, সত্যিকারের যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলাম।